মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শেষ দেউটি কি নিভে গেল?

মোহাম্মদ জানে আলম

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অতিসম্প্রতি খেলাফতে মজলিশ নামক একটি মৌলবাদী সংগঠনের সাথে যে ৫ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, তা দেশের সমগ্র প্রগতিশীল জনগোষ্ঠীকে প্রচন্ডভাবে যুগপৎ হতাশ ও বিস্মিত করেছে। মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগ সে রকম একটি বাঘের পিঠে সওয়ার হল, আজ থেকে প্রায় ষাট বছর পূর্বে সদ্য-স্বাধীন পাকিস্তানের নেতারা যে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছিল; যারই চূড়ান্ত পরিণতি একটি স্বৈরতান্ত্রিক-ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র আজকের পাকিস্তান।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগ পর্যন্ত জিন্নাহের ভূমিকা গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র দাবী করলেও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বস্তুতঃ কোন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবক্তা ছিলেন না। বস্তুতঃ অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন ও তিনি দেখেছিলেন তার রাজনৈতিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। জিন্নাহ ব্যক্তি জীবনে যেমন ধর্মপ্রাণ ছিলেন না, তেমনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতিরও তিনি বিরোধীতা করেছেন। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের হাল ধরার পর তিনি ভারতের মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা হওয়ার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ধর্মের এ ব্যবহার শেষ পর্যন্ত জিন্নাহকে দ্বি-জাতি তত্ত্ব পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলেও তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে যে বিশ্বাসী ছিলেন না তা সর্বশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়া তার পাকিস্তান গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষনে। ১১ই আগস্ট, ১৯৫৭ ইং তারিখে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন--

"আমরা একটি রাষ্ট্রের নাগরিক–এই প্রতিপাদ্য থেকেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এটিকেই আমাদের আদর্শ হিসাবে সামনে রাখা প্রয়োজন এবং আপনারা দেখবেন সময়ের ব্যবধানে হিন্দু আর হিন্দু থাকবেনা, মুসলমানেরাও মুসলমান থাকবেনা; ধর্মীয় অর্থে নয়। কারণ ধর্ম হলো মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্র। একটি জাতির নাগরিক হিসাবে তথা রাজনৈতিক অর্থে-- পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে" । তার এ বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ধর্মকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানকেও তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন; যা ছিল সোনার পাথরবাটির মত অবাস্তব। কিন্তু পাকিস্তান জন্মের এক বছরের মাথায় তার তিরোধানের কারণে কী ভাবে তিনি তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতেন, তা দেখার সুভাগ্য পাকিস্তানীদের হয়নি। মজার ব্যাপার হল, জন্মের ৬০ বছর পর পাকিস্তানী শিক্ষামন্ত্রণালয় ২০০৭ সালের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে পাকিস্তান জন্মের জন্য দ্বি-জাতি তত্ত্বের পরিবর্তে মুসলমানদে আর্থ-সামাজিক শোষণকে দায়ী বলে নতুন ভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। একইভাবে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খানও ছিলেন পশ্চিমা গণতন্ত্রের সমর্থক। কখনো পাকিস্তানকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে বানানোর চিন্তা করেননি, তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের প্রাথমিক স্বীকৃতির কাজটি তিনি সমাধা করেন। বিভাগপূর্ব আমলে ধর্মভিত্তিক দলগুলো–বিশেষভাবে 'জামায়াতে ইসলাম' ও 'মজলিশে আহরার এ ইসলাম'–পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোর বিরোধীতা করেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরোধীতার কারণে 'জামায়াতে ইসলামী' ও 'মজলিশে আহরার এ ইসলাম' প্রভৃতি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তান জন্মের পর অত্যন্ত কোণঠাসা হোয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিরে আসার জন্য তাদের কোন ধর্মীয় নোতুন ইস্যুর প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় তারা 'কাদিয়ানীরা মুসলমান নহে' এবং 'রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে' --সদ্য-স্বাধীন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অগ্রগতির প্রশ্নে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন-হাস্যস্পদ-- একটি অবান্তর ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসে। ১৯৪৯ সালে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার দাবী করে "মজলিশে আহরার এ ইসলাম" কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার আহবান করে। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট ছিল জামায়াতে ইসলামী ও তাদের তাত্ত্বিক গুরু মৌলানা মওদুদী। তাদের প্রত্যক্ষ উস্কানীতে পাঞ্জাবে কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়-- দ্রুত লাহোরেও ছড়িয়ে পড়ে এ দাঙ্গা এবং তা ক্রমে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে থাকে। দীর্ঘ চার বছর ব্যাপী চলার পর ১৯৫৩ সালে দাঙ্গা এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে, পাকিস্তান সরকার লাহোরে সামরিক শাসন জারী করতে বাধ্য হয়। এ দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। দাঙ্গার বিষয়ে তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয়। আদালত বিচারে দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ উস্কানী প্রদানের জন্য মৌলানা মওদুদীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন– যা তার প্রাণভিক্ষা আবেদনের কারনে মওকুফ করা হোয়েছিল। সৌদী বাদশাহর হস্তক্ষেপে পরবর্তী সময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ভয়াবহ দাঙ্গা পরিস্থিতি সামরিক শাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের খুশী করার জন্য এবং ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর সমর্থনের আশায় পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খান পাকিস্তানের সংবিধানে "অবজেকটিভ রেজুলেশন" যুক্ত করলেন,(যার সাথে বর্তমান আওয়ামী লীগ ও খেলাফতে মজলিশের চুক্তির অদ্ভূত মিল) যাতে বলা হল–পাকিস্তানের

সংবিধানে কুরআন ও সুন্নাহের পরিপন্থী কোন ধারা থাকতে পারবেনা। পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি যোগ করা হল এবং সংবিধানের কুরআন ও সুন্নাহের পরিপন্থী কোন ধারা আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আলেমদের নিয়ে একটি ওলেমা পরিষদ গঠন করা হল। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খান--জিন্নাহের চিন্তার বিপরীতে--মৌলবাদীদের সাথে এভাবে আপোষ করে রাষ্ট্রপরিচালনায় ধর্মের ভূমিকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন। মৌলবাদী ধর্মভিত্তিক দলগুলো এটাকে তাদের প্রাথমিক বিজয় ভেবে উলসিত হলো। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো--ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাথে আপোষ করেও লিয়াকত আলী খান বেশীদিন ক্ষমতায় ঠিকতে পারলেননা বরং আততায়ীর নির্মম গুলির আঘাতে তাকে জীবনও দিতে হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে অতঃপর যা চলতে লাগল তাহলো--প্রাসাদ রাজনীতি--ক্ষমতা দখলের দুর্দান্ত চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, পর্দার অন্তরালে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও কিছু ক্ষমতান্ধ রাজনীতিকের ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে কামড়া-কামড়ি। ইস্কান্দর মীর্জা প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইউব খান প্রধানমন্ত্রী, অতঃপর মাত্র ৩০ মাসের মাথায় ইস্কান্দর মীর্জাকে তাড়িয়ে আইউব খানের ক্ষমতা অধিগ্রহণ--এসব পরিবর্তনের সাথে পাকিস্তানের আমজনগণের কোন সম্পর্ক ছিলনা, ছিলনা কোন আদর্শিক দ্বন্দ্ব–এসব নিছক ক্ষমতার লড়াই। এমনকি জনগণ বুঝতেও পারতনা কোত্থেকে কি হচ্ছে। সব কিছু ঘটছিল পর্দার অন্ত রালে। অন্দর মহলের মলযুদ্ধে সর্বশেষ বিজয়ী নটেরগুরু জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানে ভাগ্যবিধাতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে। ক্ষমতা গ্রহণের পর বৃটিশ ভাবধারায় প্রশিক্ষিত জেনারেল আইয়ুব ১৯৬২ সালে তার ঘোষিত সংবিধানে পাকিস্তানের নাম থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি বাদ দিলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করলেন। গোঁড়া মোলাদের কট্টর বিরোধীতা সত্ত্বেও মুসলিম পারিবারিক আইনে কিছু পরিবর্তন আনলেন। কিন্তু তার এ ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানও বেশী দিন টিকলনা। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারও সস্তা জনপ্রিয়তার প্রয়োজন অনুভত হলো এবং সে লক্ষ্যে কিছু দিনের মধ্যেই ১৯৬২ সালের সংবিধানে আবারো সংশোধনী এনে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি যোগ করলেন। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বিষয় হলো, ১৯৬৫ ইং সালে ফাতেমা জিন্নাহের বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে গিয়ে একশত আলেম থেকে ফতোয়া আদায় করলেন--"ইসলামী রাষ্ট্রে কোন মহিলা রাষ্ট্র-প্রধান হতে পারেনা।" সকল বিরোধী দলের সমর্থন ও প্রচুর জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মৌলিক গনতন্ত্রীদের ভূঁয়া চেক প্রদান সহ নানা কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী হলো আইয়ুব খান। তার এ বিজয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মোলাদের অবস্থান আরো সুসংহত হলো। অবিভক্ত

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল সেদিনের পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলন দমিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানী শাসকেরা বরাবরই ধর্মকেই ব্যবহার করেছে। সর্বশেষ বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঠেকাতে গিয়ে যে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ–এ সকল অপকর্ম তারা করেছে ধর্ম রক্ষার নামে। মাত্র ২৪ বৎসরের মধ্যে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার বিপদ সম্পর্কে–কী পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ, কী সামরিক জান্তা–কেউ আদৌ কোন শিক্ষা নেয়নি। বরং সে বিপজ্জনক পথেই পাকিস্তানের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকল। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে নির্বাচনে জিতলেও জুলফিকার আলী ভূট্টোর স্বৈরাচারী অপশাসন ও নির্বাচনে প্রচণ্ড কারচুপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোটবদ্ধ আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন ধর্মীয় দলগুলোকে হাতে নেওয়ার জন্য এবং আমজনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ভূট্টোও কিছু শরীয়া আইন প্রণয়ন করলেন। একই উদ্দেশ্যে ভুট্টোই প্রথমবারের মত জামায়তের দাবী মোতাবেক কাদিয়ানীদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করলেন। ভূট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল জিয়া--এতদিন ধরে পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাথে আপোষ করে পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করারযে কাজটি তিলে তিলে করছিলেন---তার ষোলকলা পূর্ণ করলেন। ভূট্টো কাদিয়ানীদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু ঘোষণা করেছিলেন। আরো একদাপ এগিয়ে জিয়াউল হক তাদের অমুসলিম ঘোষণা করলেন। তাদের সরকারী চাকুরী থেকে অপসারণ করলেন। কাদিয়ানীদের মসজিদগুলো বন্ধ করে দিলেন। কাদিয়ানীদের আলাদা পরিচয় পত্র, তাদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা করা এবং দেশে হুদুদ আইন চালু করে শরীয়া আদালত গঠন করলেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহের স্বপ্নের বিপরীতে তার উত্তরসুরীরা পাকিস্তানকে একটি মধ্যযুগীয় ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। চুরি করলে হাত কেটে ফেলা, যৌন ব্যভিচারের জন্য মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে মারা, একজন পুরুষ সাক্ষীর বিপরীতে দু'জন নারী সাক্ষী হাজির করা--হুদুদ আইনের নামে সকল মধ্যযুগীয় আইন আজ পাকিস্তানে বিদ্যমান। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, জিয়াউল হকের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা ভাবধারায় প্রশিক্ষিত বেনজির ভূট্টো ক্ষমতাসীন হলেও জিয়াউল হকের ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে কোন সংস্কার পদক্ষেপই নিতে পারেননি কিংবা নেননি। তৎপরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন নেওয়াজ শরীফ এর আমলেই পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতায় তালেবানদের উত্থান। আজকের সামরিক শাসক মোশারফ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যতই হম্বিতম্বি করুক না কেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে--যেখানে রাষ্ট্রীয় সংবিধানই ধর্মভিত্তিকী-- ইসলামী মৌলবাদীদের কিভাবে রুখবেন তা আদৌ বোধগম্য নয়। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে মৌলবাদ আজ পাকিস্তানে অনেক শক্তিশালী। গত ২২শে জানুয়ারীর, ২০০৬ ইং 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এর এক প্রতিবেদনে লেখা হয়--আফগানিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন একটি জেলায়

বস্তুতঃ তালেবানদের শাসন চলছে। পাকিস্তানের প্রশাসন সেখানে মূলতঃ নিষ্ক্রিয়। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হলো–স্বাধীনতার দীর্ঘ ৬০ বছর পরও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতেতো পারলইনা বরং একটি ধর্মীয় গোঁড়ামী আক্রান্ত সামরিক স্বৈরতন্ত্রই হলো আজকের পাকিস্তান––যার নিগড় থেকে বের হওয়ার জন্য একাত্তুরের বাঙালিদের মত বর্তমানে লড়াই করছে বেলুচিস্তানের মুক্তিকামী জনগণ–বালুচ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

বাঙলাদেশ প্রেক্ষিত

দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে নাকচ করে বিজাতীয় শোষনের বিরুদ্ধে নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এর ফলশ্রুতি আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। সঙ্গত কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র আমাদের ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সংবিধানে সংযোজিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় উপরোক্ত আদর্শগুলোকে নীতিমালা হিসাবে গ্রহণ ছিল একটি স্বল্প-শিক্ষিত, দারিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য বাস্তবিকই অভাবনীয়– যা পশ্চিমা বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অগ্রগতির পর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন ও একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে একটি স্বল্প-শিক্ষিত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর এ সাংস্কৃতিক অর্জনের তাৎপর্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। তাই আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া শুরু করেন। (অবশ্য তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকে কিছুটা আধুনিক করার প্রয়াস পেয়েছিলেন)। অথচ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে– রাজাকার-আলবদর বাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে–তাদের নব্বই শতাংশের উপরে ছিল মাদ্রসার ছাত্র ও শিক্ষক। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের একাধিক সভা-সমাবেশে দুঃখের সাথে কথাটি উলেখ করলেও তার সরকার ইসলামী ফাউণ্ডেশন সৃষ্টি করলেন। আজকে সে ইসলামী ফাউন্ডেশন মৌলবাদীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তারপরও ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতিমালা হিসাবে বহাল ছিল–ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ অবারিত ছিলনা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যূত করে যারা ক্ষমতাসীন হলো, তারা সর্বাগ্রে তাদের এ অপকর্মের বৈধতা দিতে জনগণের সামনে আবির্ভূত হলো ধর্মের আলখালা পড়ে। এতবড় একটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে মাথায় কালোটুপি ও মুখে আলাহ-রসুলের নাম নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হলো খুনী মোস্তাক–প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিভূ হিসাবে–ক্ষমতাসীন হয়েই যে তার পরিহিত কালো টুপিকে জাতীয় টুপি ঘোষণা করেছিল। এ প্রতিবিপবের সুবিধাভোগী হিসাবে ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান দেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র মুছে দিলেন। নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে নিয়ে আসলেন বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে অধনবাদী বিকাশের পথ পরিহার করে ধনবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার পরও সুনির্দিষ্ট অভিযোগে একাত্তুরের যে সকল যুদ্ধাপরাধী বিচারের অপেক্ষায় ছিল তাদেরও ক্ষমা করে দেওয়া হলো। জামাতে ইসলামী সহ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে ধর্মের নামে রাজনীতি করার লাইসেন্স ফিরিয়ে দিলেন। জামাতের আমীর যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে দেশে এনে রাজনীতিতে পূনর্বাসিত করলেন। কতিপয় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ–বিশেষভাবে সৌদী আরবের আর্থিক সাহায্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী তাদের রাজনৈতিক প্রচারণা তীব্রতর করল–যার মূল লক্ষ্য ছিলো বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকে ভুল প্রমাণ করা এবং বাঙলাদেশকে তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করা। পচাঁত্তরের পট পরিবর্তনের পর ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতা আদায় ও আমজনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা শুরু করল পূর্ণোদ্যমে। মেজর জিয়া তার সকল বক্তব্য শুরু করার আগে প্রকাশ্যে "বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম" বলা শুরু করলেন। জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতাসীন খলনায়ক, তুলনাহীন দুশ্চরিত্র হোসেন মোঃ এরশাদ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিলেন একই লক্ষ্যে-- তার সব অপকর্মকে বৈধতা দেওয়া। তিনি সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশটাকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিলেন । ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের সাথে এরশাদ রাজনীতিতে পীরতন্ত্রের প্রবর্তন করে নোতুন মাত্রা যোগ করলেন । তিনি প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় হেলিকপ্টার ব্যবহার করে বিভিন্ন পীরের কাছে যেতে শুরু করলেন এবং এসব গণ্ডমুর্খ ও ভণ্ড পীরের উপদেশ প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রচার করতেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে এরশাদ এমন এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, যখন তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল, তখন তিনি প্রতি শুক্রবারে কোন না কোন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে যেতেন। মসজিদে গিয়ে তিনি পূর্বরাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হোয়ে সেই মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে এসেছেন বলে ডাহা মিথ্যা অবলীলায় বলে যেতেন; অথচ মানুষ জানত, এরশাদ আসবেন বলে দু'তিন দিন পূর্ব থেকেই সরকারী লোকেরা ঐ মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিল। এরশাদের পতনের পর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনী কৌশল হিসাবে নগ্নভাবে ধর্ম ও

ভারত বিরোধীতাকে কাজে লাগাল। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারে তারা এতটুকু গেল যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে ধর্ম চলে যাবে, মসজিদে মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলু ধ্বনি হবে-- দেশ ভারতের অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হবে- ইত্যাকার কথা জোরেশোরে বলে বেড়াতে লাগল । বলাবাহুল্য তারা এ অপকৌশলে সফল হয়ে নির্বাচনে জিতেছিল এবং ক্ষমতাসীন হোয়ে তারাও রাজনীতিতে-রাষ্ট্রীয় আচারানুষ্ঠানে- ধর্মের ব্যবহার বাড়িয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগও ভোটের রাজনীতির বিবেচনায় এবং বিরোধী প্রচারণার জবাবে তাদের রাজনৈতিক আচার আচরণেও ধার্মিকতা প্রদর্শণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। জয় বাঙলা শোগানের সাথে তারা ও "লা-ইলাহা ইলালাহু-নৌকার মালিক তুই আলাহ"--প্রভৃতি শোগান উচ্চারণ করতে লাগল। বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় বিভিন্ন উপনির্বাচনে বিএনপির সীমাহীন কারচুপি একটি দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলল। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করল। সে আন্দোলন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ যুগপৎ কর্মসূচী গ্রহণ করল জামায়াতে ইসলামীর সাথে। পাশাপাশি বসে মতিউর রহমান নিজামী ও শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলন পর্যন্ত করলেন। আন্দোলনের মুখে প্রথমে বিএনপি একতরফা একটি নির্বাচন-অতঃপর সে নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাশ এবং সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি সরকারের সর্বাত্মক ব্যর্থতার পটভূমিতে আবারো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলো। সুদীর্ঘদিন পর এবার ক্ষমতায় এলো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তত্ত্ববধায়ক সরকারের দাবীতে যুগপৎ আন্দোলন করতে গিয়ে জামায়াতের সাথে অঘোষিত ঐক্য করে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কী ক্ষতিটা আওয়ামী লীগ করেছে সে উপলব্ধি আওয়ামী নেতৃত্বের এখনো হয়েছে কিনা জানিনা। শুধু তা নয়, আওয়ামী লীগ ও তার রাজনৈতিক আচরণে এমন কিছু পরিবর্তন আনল যা প্রকারান্তরে ধর্মীয় রাজনীতিকেই উৎসাহিত করল। দীর্ঘদিন পর ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পূনর্বাসনের তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগত গ্রহণ করলই না, বরং তাদের দলীয় কর্মসূচী এবং রাষ্ট্রীয় কর্মসুচীতে তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুসরণ করতে শুরু করল পূর্ণোদ্যমে। সংসদে প্রত্যেক সাংসদদের মাথায় টুপি পরে বসা এবং যে কোন বক্তব্যের শুরুতেই জোর গলায় "বিসমিলাহীর রাহমানির রাহিম" বলা, কোন কিছুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে মোনাজাত করা, যে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করা, নেতা-নেত্রীর ফি বছর হজ্জ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় আচরণের সাথে রাজনৈতিক আচরণকে গুলিয়ে ফেলে অপরাপর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণের সাথে আওয়ামী লীগের আচরণের পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল-যা বস্তুতঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই বৈধতা প্রদান করছিল। দুঃখজনক ব্যাপার হল, ক্ষমতাসীন হয়ে বিএনপিতো নয়ই, আওয়ামী লীগও এরশাদ প্রণীত রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করার কথা চিন্তাও করলনা। কিন্তু এত কিছু করেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেমন থাকতে পারলনা, তেমনি যে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর মনজয় করার জন্য আওয়ামী লীগ এতকিছু করল -তাদের মন থেকেও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা মুছে ফেলতে সক্ষম হলনা। বরং জাতীয়তাবাদী দল আরো এক ধাপ এগিয়ে জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট নামক দলের সাথে জোট বেঁধে নির্বাচন করে আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হলো রাজনৈতিক স্বার্থে, ক্ষমতার লোভে যে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে নিজেদের সুবিধামত রাজনীতিতে ব্যবহার করছে, শেষ পর্যন্ত তারা কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারবেনা বরং তাদের এ রাজনৈতিক আচরণ মৌলবাদীদের অবস্থ্যানকে পাকাপোক্ত করে দিবে। ক্ষমতাসীন হয়ে জোট সরকার ধর্মপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধে তুলে দিল। ক্ষমতান্ধ হয়ে এ সামান্য বোধটুকু আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতারা হারিয়ে ফেলল যে, রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংগঠন-কোন সংগঠনের কোন ধর্ম থাকেনা। ধর্ম, তথা উপসনা-ধর্ম (Worship Religion) থাকে মানুষের--কোন বস্তু বা সংগঠনের নয়। বস্তু বা সংগঠনের ইহকাল পরকাল নেই। তারা স্বর্গ-নরকে যাবেনা। তাই তাদের ধর্মের প্রয়োজনও নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম পালনের ফলে প্রকারান্তরে বৈধতা পেল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। এভাবে সেক্যুলার রাজনীতির শিকড় কাটা হতে লাগল একে একে। বলাবাহুল্য, কেবল ক্ষুদ্র বাম গণতান্ত্রিক দলগুলো --জনমনে যাদের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির শোগান অব্যাহত রাখল। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা যেভাবে ক্ষমতার স্বার্থে তিলে তিলে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন, ঠিক সে পথেই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন। তফাৎ শুধু এই যে, আমাদের জনগণের প্রতিরোধের মুখে সামরিক আমলা এদেশে পাকিস্তানের মত শিকড় বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

এতদিন আওয়ামী লীগ তথাকথিক রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে তাদের রাজনৈতিক আচরণে ধর্মকে সামনে এনেছে। তারা যে অধার্মিক নয়, সে রকম ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য মৌলবাদী দল বা গোষ্ঠীর প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু ২০০৭ ইং সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে খেলাফত মজলিশের সাথে যে চুক্তি করেছে তাকে আর কোন কৌশল বলা যায়না, মৌলবাদী কর্মসূচীকেই আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেছে, যা তার আদর্শের চুড়ান্ত বিসর্জন। ভোটের আশায়

মৌলবাদী যে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছে আওয়ামী লীগ, ইতিহাসের শিক্ষা হলো, শেষ পরিণতিতে না পৌছে সেখান থেকে নামতে পারবেনা তারা। একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখেছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জনগণ, তাদের সে স্বপ্নের শেষ দেউটি কী নিভে গেল? নাকি সমাজ ও সভ্যতার অপরিহার্য বিকাশের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উন্মেষ ঘটবে বিকল্প কোন সাংগঠনিক শক্তির, যার পিছে জড়ো হয়ে মানুষ আবারো স্বপ্ন দেখবে এগিয়ে যাওয়ার।

তথ্যসূত্রঃ

* *ইসলাম, রাজনীতি এবং রাষ্ট্র–পাকিস্তান অভিজ্ঞতা-সম্পাদনা–আসগর খান*

- *General in Politics- By-Asgar Khan*
- *Religion in Global Politics- Jeff Haynes*
- *Pakistan: Nationalism without a Nation—Edited by- Christophe Jaffrelot*
- *Will Baluchistan Break Out of Pakistan ?*
  Frédéric Grare-- January 31, 2006—Source –internet
- *Politics of History—Imtiaz Gul*